একক 2 ❑ 'সে'

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 রবীন্দ্র-রচনাধারায় 'সে'

2.3 'সে' গ্রন্থটি উৎকল্পনায় হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ: 'সে গ্রন্থটি উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ কী'—এই জিজ্ঞাসার.....। এইভাবে হবে।

2.4 "আলাপে, গল্পে, রসিকতায় 'সে' বড়োদের বই"।

2.5 রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং চিত্রিত 'সে'—কয়েকটি কথা।

2.6 অনুশীলনী

2.7 সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা ঃ

'সে' গ্রন্থটির প্রকাশকাল বৈশাখ, ১৩৪৪ (ইং ১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের ধারায় 'সে' একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। ১৪ অধ্যায় বিন্যস্ত 'সে' গ্রন্থের প্রধান গল্পকথক 'আমি' শ্রোত পুপদি, আর 'সে' কখনও অপ্রধান গল্পকথকের ভূমিকায় এসেছে। এই 'সে' হল মূলক লেখকের আজগুবি গল্পের মূল অবলম্বন, অসম্ভব গল্পের বহুরূপী। লেখকের ভাষায় 'সে' হল 'নামহারা বানানো মানুষ' 'কেবল বাক্য দিয়ে তৈরি'। রবীন্দ্র মানসে যেসব অসদ্ভব কল্পনা ভিড় করে এসেছে 'সর্বনামধারী' এই 'সে' চরিত্রটিকে আশ্রয় করে তাকে গল্পরূপ দিয়ে লেখক পুপুদিকে আর পাঠকসমাজকে শুনিয়েছেন।

২.২ রবীন্দ্র-রচনাধারায় 'সে' ঃ

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা রাজশেখর বসু অসম্ভবকল্পনার সুদক্ষ ক্রীড়াশিল্পী। এই অসম্ভব কল্পনার সুদক্ষ ক্রীড়াশিল্পী। এই অসম্ভব কল্পনার জগতে সাবলীল বিচরণই ত্রৈলোক্যনাথের প্রধান পরিচয়, রাজশেখর বসুর ক্ষেত্রে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় মাঝে মাঝে কল্পনার উদ্ভট মুখ উঁকি দিলেও জীবনের শেষ দশকে তিনি এইধরনের রচনায় লেখনী ধারণ করেছিলেন। যদিও তাঁর প্রথমদিকের কয়েকটি লেখায়— 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে, 'হিং টিং ছট' কিংবা 'জুতা আবিষ্কার' কবিতায় কল্পনার উদ্ভট ল(ণ দেখা গেছে। কিন্তু তা রূপকের বাইরে 'রূপ' হয়ে আসতে পারেনি। ১৯৩৬-৩৭ সালে যখন 'খাপছাড়া' কিংবা 'সে' লেখা হচ্ছে, তখন এই অসম্ভব কল্পনা একটা 'রূপ' হয়ে ধরা দিল।

অবশ্য প্রথমপর্বের রচনায় উৎকল্পনার হাস্যরসের অনুপস্থিতির একটা কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন 'জীবনস্মৃতিতে। বলেছেন— 'এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে।..... সেইসময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম আপনার কৌলিন্য প্রমাণ করবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ....আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখনকার এই আন্দেলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতকবা ব্যঙ্গ কাব্যে(কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার 'সঞ্জীবনী' কাগজ পত্র-আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিতে তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছিল।' স্বভাবতই এযুগে হাস্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ব্যঙ্গ ও আঘাত প্রবণতার

পথেই হেঁটেছেন। এমনকি কখনো ব্যক্তি(গত আক্র(মণও করেছেন নিজ(চির বাইরে গিয়ে। হিন্দুয়ানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে আগ্রহের আতিশয্য অন্ধগোঁড়ামি, বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব এব পান্ডিত্যপ্রকাশের ভান রবীন্দ্রনাথকে অসহিষু(করে তুলেছিল। বিশেষ করে শশধর তর্কচূড়ামণি এব চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নব্যহিন্দুর ধর্ম আন্দোলন সেদিন কবিকে বাধ্য করেছিল বিদ্রূপবাণ নি(েপে তাঁদের প্রতিহত করতে। 'কড়ি ও কোমল'-এ, 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কবিতায় 'হাস্যকৌতুকে' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে', 'বালক' 'ভারতী' 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি তীব্র ব্যাঙ্গের যুগই রচনা করেছেন।

উৎকল্পনা এখানে এসেছে আঘাত-বিদ্রূপের রূপে, যেমন হিং টিং ছট (সোনার তরী) কবিতাটি। প্রত্নতত্ত্ব (১২৯৮ সন) প্রবন্ধের গদ্যরূপে যে আঘাত কবি সমকালীন বিষয়কে করেছেন, ১২৯৯-এ লেখা উক্ত(কবিতাটি তারই পদ্যরূপ মাত্র। এ কবিতায় রাজা হবুচন্দ্রের স্বপ্নদর্শন একটি উদ্ভট হাস্যকর উদ্ভাবনা। কিন্তু তার আড়ালে জগৎ-বিখ্যাত অমার 'ধর্মপ্রাণ' জাতির পরমত অসহিষু(তা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির ঊনতার ওপর স্পষ্ট বিদ্রূপ। গৌড়ীয় সাধু হিং টিং ছট-এর ব্যাখ্যায় বলেছে—

ত্র্যাম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তি(ভেদে ব্যক্তি(ভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি(শিবশক্তি(করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি।
আর্ণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি(সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ীশক্তি(ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট,
সং(েপে বলিতে গেলে—হিং টিং ছট''।

এবং এই ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েই তৎকালীন পণ্ডিতদের অর্থহীন বাক্‌সর্বস্ব ভণ্ডামির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যাঙ্গাত্মক আঘাত।

তবে এই ধরনের ব্যাঙ্গবিদ্রূপ কবির স্ব(েত্র ছিল না, ব্যক্তি(গত আক্র(মণ ছিল তাঁর স্বভাববি(দ্ধ আর তাঁর চারিত্রিক কমনীয়তাও যেন এখানে আবৃত হয়েছিল। যদিও এ আসরে অবতীর্ণ রবীন্দ্রনাথ প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই। তাই ১২৯৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ব্যাঙ্গবিদ্রূপের বিরাট মুখব্যাদানের মধ্যেই কবি কখনো আত্মগোপন করতে চেয়েছিলেন কৌতুকের মধ্যে। শ্রাবণের পত্র (মানসী), ছিন্নপত্রের পত্রালাপ 'হাস্যকৌতুক'-এ ব্যাঙ্গ(-যের তী(কশাঘাতের মধ্যেও কয়েকটি নাটিকায় কবি বিশুদ্ধ আমোদ পরিবেশন করেছেন। একসময় তাঁর মনে হয়েছিল 'সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।'' ক্র(মশ নিষ্ঠুর আঘাত ও (-য বিদ্রূপ থেকে বিমুক্ত(কৌতুকহাস্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রহসন হল 'গোড়ায় গলদ' (১২৯১)। পরে এই মার্জিত সংস্করণ 'শেষর(া' (১৩৩৫)। আর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩) ও 'চিরকুমার সভা' (১৩৩২), প্রহাসিনী (১৩৪৫) গল্পস্বল্প (১৩৪৭) ইত্যাদি রচনায় কৌতুকহাস্যই মুখ্য ফলপরিণাম রচনা করেছে। কিন্তু জীবনের শেষ দশকের হাস্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধিকে খেলিয়ে 'খ্যাপামি' করবার,

৭৬ বছরের প্রবীন কবি তখন কৈশোরকে চাপল্যে উচ্ছলিত। আর এর পাশাপাশি রয়েছে মহান স্রষ্টার কল্পনা ও শৈল্পিক চাতুর্য, কবিমন আবার চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসী, বারবার এক স্থান থেকে অন্য কোথা অন্য কোনোখানে তার বিরামহীন যাত্রা। 'খাপছাড়া' ও 'সে' রচনাকালে রবীন্দ্রচিত্ত চিত্ররচনায় উৎসুক। সাদা পৃষ্ঠায় খেয়ালী আঁচড় টানায় অথবা লেখাকে কাটাকুটি করে কোনো বিশেষ রূপদান করার খেয়ালী মন থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবির সৃষ্টি। বস্তুত, বিধিবদ্ধ শি(া থেকে দূরে অনুশীলনহীন আঙুলের সৃষ্টি বলেই আঙ্গিক ও শৈলীর দিক থেকে দুঃসাহসিকতায় আঁকা বিচিত্র রহস্যময়তার প্রকাশ এই মৌলিক ছবিগুলির ভিন্ন এক আকর্ষণও আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবির যুগ তাঁর শেষ আধার বছরের ভাষিক সৃষ্টি—কাব্য-গান-নাটক-গল্প-উপন্যাস সবকিছুকেই বহিরঙ্গ যুগপৎ অন্তরঙ্গে তা অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা কোনো গড়ে-তোলা সামগ্রী নয়, হয়ে-ওঠা জিনিস। হয়তো তা খেয়াল কিন্তু অসংলগ্ন নয়(রেখাঙ্কনের বৈজড়ানিক নিষ্ঠা সেখানেও একভাবে কাজ করেছে। রেখা নিয়ে এই সময়ে কবির এই খেলা-ই তাঁকে 'খাপছাড়া' কিংবা 'সে'-র খেয়ালী লেখায় প্রবৃত্ত করেছিল। 'সে' গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন— ''একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি.....দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়, সেই লেকাট।'' তখন রেখার খেলা থামিয়ে রেখে কবি উদ্ভট চরিত্রের সেই লোকটার গান শুনতে বসলেন। অর্থাৎ এটাই স্পষ্ট হল যে, রেখার খেয়াল খেলাই রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে লেখার খেয়াল খেলায় নামিয়েছে।তাছাড়া, তাঁর ছবির শরীরে সনাতনী রীতির বি(দ্ধে যে বিদ্রোহ রয়েছে, সে বিদ্রোহই কবিকে বহু-অনুশীলিত উপন্যাস-কাব্য-নাটক-প্রবন্ধের পরিচিত সরণি থেকে খাপছাড়া উদ্ভটের রাজ্যে উত্তীর্ণ করেছে। এই খেয়ালের সঙ্গে কবিমনের প্রবল কৌতুক হাস্যপ্রবণতা, স্বভাবের উদারতা ও কোমলতা এবং সর্বোপরি তাঁর বিস্ময়কর কল্পনাশক্তি(যুক্ত(হয়ে উৎকেন্দ্রিকতার প্রসন্ন হাস্যের রূপ নিল 'সে' এবং খাপছাড়া'তে। এর সঙ্গেযুক্ত(হয়েছে কবির সমকালীন বিজ্ঞানচর্চা—রবীন্দ্রনাথ তখন পড়ছেন আইনস্টাইন, জীনস্, এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞান-ভিত্তিক 'বি(েপরিচয়' এই একই বছরে প্রকাশিত হল সে। যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো বলেই দেশে-বিদেশে যারা এই ধরনের অসম্ভব কল্পকথা লিখেছেন—Edward Lear, Raspe, h.G. Wells, Carroll কিংবা এদেশে ত্রৈলোক্যনাথ, সুকুমার রায়, কিংবা রাজশেখর বসু—সকলেই বিজ্ঞানীমনের অধিকারী ছিলেন। এইসূত্রেই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা, চিত্রচর্চা এবং 'খাপছাড়া' ও 'সে' কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একই মানসসূত্রে এরা পরস্পর গ্রথিত।

শুধু এই বই দুখানি সহজ জন্মসূত্রে বাঁধা নয়—দুটি বইয়ের উদ্দেশ্যও এক। কী সেই উদ্দেশ্য? 'একেবারে যা-ইচ্ছে তাই, মাথা নেই, মুন্ডু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই এমন একটা কিছু।'' (ণে (ণে বদলে যায় তার রূপ— শরতের আকাশ হালকা মেঘ যেমন কখনো পালতোলা নৌকা, কখনো শুঁড়তোলা হাতি, কখনো রূপকথার দৈত্য। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সারাদিনের গুরুগম্ভীর বাঁধা নিয়মের সৃষ্টির পর সন্ধ্যার ঘুমে মুক্তি(আর চিন্তার পারম্পর্যহীন স্বপ্নের জাল বুনে চলেন—তাঁর সেই স্বপ্নগুলোর মতো দায়হীন ভারহীন কিছু গড়ে তোলা। 'সে'র উৎসর্গে তো বলাই হয়েছে—

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘকালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি,
রয়েছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে

ছবির খেয়ালে রাশি রাশি
মিশেছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেব পিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গনতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নি(দ্দেশে
বাউলের বেশে—

এখানে যে কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছে গভীর সুরে, তারই লঘু প্রতিধ্বনি যেন 'খাপছাড়া'র উৎসর্গে—চতুর্মুখ ব্রহ্মার তিনটি মুখে দর্শন, বেদ এবং কবিতার অবস্থান(আর চতুর্থমুখে—

নিশ্চয় জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগ্‌লামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।

অর্থাৎ 'সে'-তে ব্রহ্মার খেয়ালের স্বপ্ন আর 'খাপছাড়া'য় তাঁর পাগলামির অট্টহাসি—একদিক থেকে দুই-ই এক—অবসরের আনন্দে খেয়ালখুশি স্বপ্নজাল বোনায় এদের সৃষ্টি।

'খাপছাড়া'র কবিতাগুলির বহিরঙ্গে যেমন শিশুদের জন্য কৌতুক আর অন্তরঙ্গে বড়োদের জন্য রূপক(তেমনই 'সে' যেন বড়োদের দৃষ্টি দিয়ে ছোটদের মনের রহস্য বোঝবার চেষ্টা(ছোটদের গল্প কী হতে পারে তাই নিয়ে নানাধরনের পরী(া-নিরী(, নির্মাণ-বিনির্মাণ, প্রসঙ্গত আধুনিক সাহিত্যে আর একালের মানসিকতাকে কিচু কিছু নির্মল কৌতুকের আঘাত দেওয়া, হাস্যরসের স্বরূপ-সন্ধান আর সবশেষে সুকুমারআর পুপে দিদিকে নিয়ে একটি গভীর গল্পের ব্যঞ্জনা—জীবনের সমস্ত হাসিই যে অশ্রুর বৃন্তে মুকুলিত সেই গূঢ় সত্যকে দ্যোতিত করা।

এই বইটিতে গল্প গড়বার কাজে ভুমিকা তিনজনের। লেখক আছেন, ন'বছরের নাতনি পুপে আছে, আর আছে 'সে'। রাজপুত্র নয়, সওদাগরপুত্র নয়, কোটালপুত্র নয়—একেবারে কাছের রক্ত(মাংসের মানুষ—খিদে পেলে যে 'ফরমাস করে মুড়োর ঘন্ট, লাউ-চিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি, বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুছে খায়।' বর্ষার দিনে সারা গায়ে জল-কাদা মেঘে ঘরে ঢুকেই বিকট বেসুরো গলায় গান ধরে—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভবান্ত হবে ভবে।

এই 'সে'-কে নায়ক করেই বেশির ভাগ গল্প—অন্য গল্পও দু-একটি আছে। ল(ণীয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে একভাবে কিন্তু গল্পের নায়কের প্রচলতি চেহারাটা ভেঙে দিচ্ছেন। লেখক একথাও বলে নিয়েছেন যে, 'সে' আসলে বাস্তব মানুষ, সুপু(ষ, সুগম্ভীর। 'রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের

মানুষ, তাই কোনো ঠাট্টা মসকরায় ওকে জখম করতেপারে না। এইরকম একজন আপাদমস্তক বাস্তব মানুষকে এরকম উদ্ভট গল্পের নায়ক করা হয়েছে কেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মান হানি হয় না(সুবিধে হয়, পুপুর সঙ্গে ওর স্বভাবের মিল হয়ে যায়।'

অতএব শুরু হল ন' বছরের একটি মেয়ের জন্য গল্প তৈরির কাজে দুটি বয়স্ক পুরুষের সরস আলোচনা, বিচার আর পরী(া-নিরী(ার পালা। প্রথমেই লেখক তৈরি করলেন হুঁ হাঁউ দ্বীপের সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক রসিকতা—যেখানে নির্বাক পণ্ডিতেরা হৃদযন্ত্রকে বৈকল্য থেকে বাঁচাবার তাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, আর ঘাসের থেকে সবুজ সার নিষ্কাশিত করে তারই নস্যি মুঠো মুঠো নাকের ভেতরে ঠেসে দিতে থাকে। দেখা গেল এ গল্প তেমন জমল না— কাহিনীটা পুপোদিদির একেবারেই পছন্দ হয়নি। কিন্তু গল্প-শেষে সিদ্ধান্তটি লেখকের মনের কথা— 'আমি ভাবছি, হুঁ হাঁউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপ বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছিনে।

দ্বিতীয় গল্প—'শিবাশোধন সমিতি'র রিপোর্ট। হৌ হৌ নামের একটি উচ্চাভিলাষী শেয়াল-এ গল্পের নায়ক—সে আত্মিক উন্নতির জন্য মানুষ হতে চেয়েছিল। এই মহতী ল(্যে প্রথমেই নাম-বদল করতে হয়, সুতরাং 'হৌ হৌ' হল শিবুরাম—পছন্দ না হলেও শেয়ালকে তা মেনে নিতে হল। তারপর এল ল্যাজ কাটবার পালা—শেয়ালের মুখ গেল শুকিয়ে। ঐ ল্যাজের জন্যেই তো 'সাধারণ শেয়ালেরা ওর নাম দিয়েছিল ''খাসা লেজুড়ি'' আর যারা 'শেয়ালি সংস্কৃত' জানত তারা বলত ''সুলোম-লাঙ্গুলী''- 'মানুষ' হওয়ার আশায় সেই 'প্রিয়' ল্যাজও তাকে কেটে ফেলতে হবে। এরপরেও অপে(া করে থাকে আর এক নির্মম সত্য—গায়ের লোম ছেঁটে ফেলতে হবে, তবেই না মানুষের মধ্যে গণ্য হবে? সেই রোঁয়া চাঁছার নিদা(ণ পর্ব এবং পরিণামে মোহমুক্ত(শেয়ালের মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বেড়ানো

ওরে ল্যাজ, হারা ল্যাজ, চ(ে দেখি ধুঁয়া
ব(মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া।

কিন্তু এ গল্প জমল না। কেননা, ছোটদের গল্পে তত্ত্ব আর বুদ্ধির চাতুর্য খাটে না (ল(ণীয়, শেয়ালের মানুষ হবার বাসনায় এ-গল্পে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ব্রিটিশ অভিমুখিতার ছবি আছে)। 'সে' লেখককে বলেছে, 'বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। ....ল্যাজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল দেখতে পাওনি বুঝি?'

এবার তাই 'সে'-র আবির্ভাব গল্প বলার আসরে, সে শোনালো 'গেছো বাবা'র উপাখ্যান। যে দেবতা বানরের রূপ ধরে চলতো কিংবা কয়েৎবেলের গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়ান, তাঁর 'শ্রীল্যাজ গলায় বেঁধে অন্তিমে চ(বন্ধ' করবার জন্য গোবরা-উধো-পঞ্চুর ব্যাকুল আর্তি। কিন্তু—

'ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়'।

'সে'-এর আখ্যানমালায় এরপর একটির পর একটি গল্প রচনার চেষ্টা। তাতে 'সে'-এর মেয়ে দেখা আর বিয়ের কাহিনী আছে, বাঘেরা যে আসলে কত আন্তরিক, রসিক আর 'হাসিয়ে' সেইটে বোঝাবার জন্য পুপোদিদির সঙ্গে বিশদ আলোচনা আছে, গায়ের কালো দাগ ওঠাবার জন্য পুঁটুর কাছে বাঘের 'গি-সারিন সোপ' প্রার্থনা আছে, বটুরাম ন্যাড়ার পাল্লায় পড়ে লোভী বাঘের দুর্গতির বিবরণ আছে। শিশুচিত্তের অকৃত্রিম আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে পড়েছে ৭ নম্বর সরস গল্পটিতে—যেখানে রয়েছে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে 'সে'-র গা হারানোর কাহিনী, তারপর গাঁজাখোর পাতু খুড়োর শরীরে তার অনধিকার প্রবেশ। শিশু মনস্তত্ত্বের অপূর্ব প্রকাশ আছে বাঘের গল্পে কিংবা খরগোশের পুপে-হরণ

কাহিনীতে। গা-হারানোর কাহিনী যেমন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডুম(ধরের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়, 'সে'-র মাথায় বানরের মগজের কাহিনী ভিন্নতর ল(্যেই চালিত হয়। ঘন্টাকর্ণের দুকানে বাঁধা ঘন্টার শব্দ শুনতে শুনতে খরগোসের পিঠে চেপে পুপুর চাঁদের দেশে যাত্রায় কাহিনীবিন্যাসের অপূর্বতা বিশেষরূপ ল(ণীয়। এখানে দাদু-নাতনির কথোপকথন এই রকম

'আচ্ছা বলো দেখি, খরগোশ কী করে আমাকে পিঠে করে নিলে।

নিশ্চয় তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমুলে কি মানুষ হাল্কা হয়ে যায়?

হয় বই কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড়োনি?

হাঁ উড়েছি তো।

তবে আর শক্ত(টা কী। খরগোশ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলাব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙদৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ। ছি ছি ছি। শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নাই।—ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথে ব্যাঙ্গমা দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি কি?

হ্যাঁ, হয়েছিল বই কী।

কী রকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বললে, পুপে দিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোশ এমন দৌড় মারল যে ব্যঙ্গমা দাদা পারল না তাকে ধরতে।''

কিংবা পরিবেশ-নির্মাণে খেয়ালি নৈপুণ্যের প্রমাণ ৪ নম্বর গল্পে—

''গাড়িতে চড়ে বসলুম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরধারে আশশেওড়া ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশেয়ালী উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাক, পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িশুদ্ধ গিয়ে পড়ল এক গলা জলের মধ্যে। এদিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুত্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিশ আর পাবিনে।.....এদিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী করে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো প্যাক প্যাক করে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। পুত্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম পাচ্ছে।''

আরো অনেক ধরনের গল্প এখানে আছে, স্মৃতিরত্নমশাই-এর মনুমেন্ট-লেহনের মতো উৎকল্পনা আছে, মাস্টারমশাইয়ের আখ্যান আছে, তাসমানিয়ার উৎকট ভোজের বিকট বিবরণ আছে। কিন্তু 'সুকুমার'-র আগমনে শেষপর্যন্ত 'সে' শুধু শিশুচিত্তরঞ্জিনী গল্পের বই না হয়ে জীবনের গল্প হয়ে উঠল। পুপেদিদি আর সুকুমারের গল্প শৈশব থেকে পাড়ি দিল বয়ঃসন্ধির বর্ণময় আকাশে। জীবনের গল্প তো এইরকমই হয়। আনন্দ কৌতুক আর খেলা দিয়ে তার শৈশব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তারপর ক্র(মশ বয়স পেরিয়ে যেতে থাকে বয়সের এক-একটা মাঠ, দিনের

প্রথম নরম আলো ত্র(মস কড়া রোদ হয়ে ওঠে, ফুল ঝরতে থাকে, প্রজাপতির কী সুখে ঐ ডানা-দুটির মেলে দেওয়ায় ত্র(মশ জমে বিষাদ, ধুলো ওড়ে, বেদনা গাঢ় হয়। ''তারও পর সন্ধ্যার ছায়া নামলে আকাশে সেই চিরন্তনের সংবাদ—সেই দূর-দূরান্তের তারাদের ভিড়, রূপকথার রাজকুমার সুকুমার—যে শালগাছ হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে মর্মর তুলতে চেয়েছিল, সে ন(ত্রলোকের নীরবতার হারিয়ে যা। তারপরে তো আর গল্প নেই। (কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

২.৩ 'সে' গ্রন্থটি উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ ঃ

'সে' গ্রন্থটি উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ কী—এই জিজ্ঞাসার গল্পময় ব্যাখ্যা সাধারণত হাস্যরসের চারটি প্রকারভেদ আমরা করে নিয়েছি Humour, Satire, Wit এবং fun। হাসি দিয়ে অপূর্ব করুণরস ও মর্মান্তিক দুঃখের আকস্মিক দ্যোতিনা শ্রেষ্ঠ Humour, রচয়িতার লক্ষ্য। জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি, একধরনের উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সঙ্গে আমোদপ্রিয়তার এক মিশ্র অনুভূতি হিউমার-এর বৈশিষ্ট্য। মৃদু এবং অনুচ্চ এই হাসির গভীরে বহমান বেদনার স্রোত রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন— এ যেন বাহিরে ঘরে হাসির ছটা/ভিতরে বহে চোখে জল'। Wit-এর আবেদন বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্কে—উইট-এর জগৎ সজ্ঞান, সচেতন ও মননশীল, এখানে পাণ্ডিত্যের বিকাশ, উইট-এর দীপ্তি তীব্র, তী(, বিপরীতধর্মী বাক্যের ওপর নির্ভরশীল। অনুপ্রাস, (-ষ, Antithesis, Paradox, Oxymoron ইত্যাদি অলংকার উইট এলখেকের শানিত অস্ত্র। Satire-এর হাসি অন্যকে আঘাতের মধ্যেই জন্ম নেয়। ব্যক্তি বা শ্রেণী-মানুষের দুর্বলতার ওপর, সমাজ বা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর সাসির কশাঘাত হেনে সংস্কারমানসে তথা সংশোধন প্রবলণতায় Satire এর উদ্ভব। এই ব্যাঙ্গের মধ্যে উপহাসের জ্বালা রয়েছে, তার আঘাতে 'মুখের হাসি বেদনায় বিকৃত হইয়া পড়ে।' আর 'কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি', কৌতুক হাসি বা Fun-এর মধ্যে উচ্ছ্বসিত আমোদ রয়েছে। ''Humour-এর মতো কৌতুকের আড়ালে কোন গভীর জীবনানুভূতি নেই; Satire-এর মতো হাসির কশাঘাতে সংস্কারমানসের একাগ্রতাও নেই, wit-এর বুদ্ধিদীপ্ত অভিজাত ও বাক্প্রসূত হাসি কৌতুকের হাসি নয়। Fun অনেকাংশে 'An art to drown the outery of the heart.'' যদিও অল্পবিস্তর 'পীড়ন' কৌতুকের মধ্যেও বিদ্যমান। অর্থাৎ অশ্রু-আঘাত দাহমুক্ত প্রসন্নমনের বিশুদ্ধ হাস্যসৃষ্টিতে এই চারপ্রকার হাসিই শেষপর্যন্ত একভাবে অপারগ।

কিন্তু অশ্র-আঘাত-দাহবিমক্ত বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন 'তাকে একটুখানি হাসিয়ে দেই গে—বিশুদ্ধ হাসি, তাতে ভেজাল নেই। 'শুধু' 'বুদ্ধির ভেজাল' নয়, সেখানে 'ব্যঙ্গ' 'চোখের জল' 'প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামো' ও থাকবে না। এ এক অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ হাসি delightful relief কিবা divine light আবালবৃদ্ধ সকলেই এই বিশুদ্ধ হাসির অংশীদার। বস্তুত, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক ভাঙাচোরা অপমান ব্যর্থতা হতাশার পরেও মানবমনের গভীরে থাকে একটি প্রসন্ন উচ্ছল লঘু প্রকৃতি। এই মন ক্ষণে ক্ষণে চায় যাবতীয় Seriousness থেকে মুক্তি পেতে। জীবনে যত জটিলতায় গ্রন্থি পড়ে, তত সেই খেয়ালি মনটা নানাভাবে সহজাত সৌন্দর্যের মধ্যে ফুটে উঠতে চায়। এই নিয়মেই উনিশ শতকে যন্ত্রপীড়িত ইংল্যান্ডের কঠিন রূঢ় বাস্তব পরিবেশে Alice's Adventures in Wanderland-এর 'delightful relief of the absurd' সৃষ্টি সম্ভার হয়েছে। 'ধ্বংস' (গল্পস্বল্প) রচনায় রবীন্দ্রনাথ বললেন—

সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কল বল সম্বল সিভিলাইজেশনের

তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।

'সিধা' করে দেবার জন্যই অসম্ভবের ব্যাকরণ তিনি রচনা করলেন 'খাপছাড়া' 'সে' এবং 'গল্পসল্প'-এ, তখন 'কলম আমার বেরিয়ে এলো বহুরূপীর বেশে।' সত্তরোর্ধ কবি উদ্ভট কল্পনায় সরব হয়ে উঠলেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা রাজশেখর বসুর রচনায় এইধরনের উদ্ভট কল্পনার একটা বড় জায়গা রয়েছে।

অর্থাৎ প্রসন্ন মনের এই অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করতে গিয়ে স্রষ্টারা আশ্রয় নিলেন কল্পনার বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির। কল্পনার সেই শক্তির সাহায্যে তাঁরা নানারকম উদ্ভট-আজগুবি-খাপছাড়া চরিত্র-ঘটনা-কাহিনী নির্মাণ করে আমাদের 'বিশ্বাস-বিচারবুদ্ধি-কার্যকারণ সম্পর্ক ও সঙ্গতিবোধকে উলটপাক খাইয়ে দিলেন।' আর পাঠক স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সাহিত্যে যখন এই বিশুদ্ধ হাসি রূপ লাভ করেছে, পাশ্চাত্যে তাকে Bizarre, Grotesque, Nonsense Literature বলে চিহ্নিত করেছে, বাংলা সাহিত্যে একে 'উৎকল্পনার হাস্যরস' অভিধায় গ্রহণ করা হয়েছে। (প্রসঙ্গ : উৎকল্পনার হাস্যরস : ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী)

রবীন্দ্রনাথ 'উৎকল্পনা' শব্দটি ব্যবহার করেননি, বলেছেন 'অসম্ভব কল্পনার সৃষ্টি'। এবং দেখিয়েছেন, বিশ্বাস্য বাস্তব পৃথিবীর পথপ্রান্তর দেশকাল ইতিহাস ভূগোল আশ্রয় করেও কবিকল্পনা যখন বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে অবিশ্বাসের কল্পনার জগতে সফল যাত্রা করে এবং যখন লেখকের এই অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করে তোলবার প্রয়াস দেখে পাঠক মজা পেতে পারেন তখনই অসম্ভব কল্পনার হাস্যরসের সার্থক সৃষ্টি। উৎকল্পনার হাস্যরসের সাধারণ লক্ষণ এই-ই। এখন দেখা যাক, উৎকল্পনার হাসির স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তাঁর 'সে' রচনার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৪ অধ্যায় যুক্ত 'সে'-র ১ অধ্যায়ে 'যা সৃষ্টিছাড়া বড়োবাজারে, বহুবাজারে এমনকি নিমতলাতেও যার গতি নেই'—তা নিয়ে গল্প তৈরির প্রস্তুতির কথা। ২ থেকে ৯ অধ্যায় পর্যন্ত 'সে' এবং 'আমি' পরম উৎসাহে পুপুদিকে অসম্ভব কল্পনার গল্প বলেছে। তাদের উদ্দেশ্য এসবের মধ্যে দিয়ে পুপুদিকে হাসিয়ে তার মন জয় করা। আর লেখকের উদ্দেশ্য সেই মুহূর্তটির নির্মাণ যখন উৎকল্পনার হাস্যরস সৃষ্টি হয়। প্রতিটি গল্প-উপান্তে পুপুদির চোখে জল, ক্রোধগম্ভীর কিংবা ভাবুক পুপুদির এই বিচিত্র অভিব্যক্তিই প্রমাণ করে যে নির্ভেজাল প্রসন্ন হাসি তার মুখে আনা কঠিন ব্যাপার। ব্যর্থ হয়ে একসময় 'সে' বলেছে, 'যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়।' কখনও 'আমি'ই বলতে বাধ্য হয়েছে 'এ-কাহিনীটা পুপুদির কাছে একটুও পছন্দসই হয়নি।' প্রকৃতপক্ষে, অবিশ্বাস থেকে মজা আহরণের দুরূহ কৌশলের মধ্যেই অসম্ভব কল্পনার হাস্যসৃষ্টির শিল্পচাতুর্য নিহিত।

প্রথম গল্পে হুঁ হাউ দ্বীপের মানুষের নস্যি নিয়ে পেট ভরানোর অসম্ভব গল্প পুপু বিশ্বাস করল না—'এ কখনো হয়? নস্যি নিয়ে পেট ভরে?' আসলে এখানে অবিশ্বাস উৎপাদনের উপকরণটিই ভুল নির্বাচিত হয়েছে। কেননা 'নস্যি' বস্তুটাকে নিয়ে কল্পনার জগতে খুব বেশিদূর এগোনো যায় না। এখানে হাসবার মতো মজা পুপুদি এবং পাঠক কেউই খুঁজে পায়নি। আর রবীন্দ্রনাথ দেখালেন অবিশ্বাস্য হলেই অসম্ভবের গল্প হয় না।

দ্বিতীয় গল্পে শেয়ালের মানুষ হবার লক্ষ্যে লেজ-কর্তন এবং অসম্ভব কল্পনা সত্ত্বেও এ গল্প শেষপর্যন্ত ব্যঙ্গ ও কারুণ্যে ভরে উঠল। 'প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি' এ কাহিনীর সর্বাঙ্গে। ল্যাজকাটা শেয়ালের কান্না শুনে পুপুদির চোখও জলে ভরে গিয়েছিল—এখানে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, অসম্ভব কল্পনা হলেই অসম্ভবের গল্প হয় না, এ-জগতের সচেতন বুদ্ধিকে সজাগ রেখে অসম্ভবের গল্প-কথন দুরূহসাধ্য।

অতএব, পুপুদিকে বিশুদ্ধ হাসি হাসাবার অভিপ্রায়ে 'সে' নিজেই তৃতীয় গল্প তৈরি করল। গেছোবাবার অদ্ভুত কল্পনা, আরো অদ্ভুত তার ভাবভঙ্গি। কিন্তু এবারও হার মানতে হলো। এবার পুপুদিদি গেছোবাবাকে এমন বিশ্বাস করে বসল যে তার সন্ধান করতে বুঝি স্বয়ং 'সে'-কেই পাঠায়। 'আমি' হেসে 'সে' কে বললে—'ওহে কমবুদ্ধি হাসাতে পারলে?' 'সে' ব্যথাহত ভাবে বলল, 'না, যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে, তাকে হাসানো সোজা নয়।'

এইভাবে এই গল্পত্রয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইলেন, এলোমেলো অসম্ভব কথা হলেই উৎকল্পনার হাস্যরসের গল্প জমে না। উৎকল্পনার নিজস্ব একটি পথ আছে চলবার, বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে অবিশ্বাসের দিকে তার অভিমুখ। কিন্তু এই তিনটি গল্পে অসম্ভবের রেখা পেরিয়ে সীমার জগতের বিশ্বাস-অভিজ্ঞতা-বুদ্ধি-অনুভূতির মধ্যে আবদ্ধতা চোখে পড়ে। ফলে বিশুদ্ধ হাসির পরিবর্তে কখনো পুপুর 'চোখে জল, ব্যঙ্গ-আঘাতে ব্যথা, অসম্ভবকে বিশ্বাস।' ৪ গল্পে এসে রবীন্দ্রনাথ অসম্ভব কল্পনার যথার্থ স্বরূপসন্ধানের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কিনা'—চতুর্থ গল্পটি সেই পরীক্ষাজাত। এখানে 'সে' ও 'আমি'র কনে দেখতে যাওয়া ও 'সে'র বিয়ের গল্প। খেঁকশিয়ালের ডাকে চমকে পুত্তুলালের গাড়িসমেত পুকুরে পড়া, ব্যাঙের নাচে পিঠের জমানো বাত সেরে যাওয়া, এসবের মধ্যে প্রাপ্ত মজার চরম 'সে'-র নতুন বউ ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে বরকে নিয়ে বাজারে মানকচু কিনতে যাওয়া। এ-গল্প শুনে পুপুদি খুব খুশি। কনে এখানেও বরকে জব্দ করেছে, কিন্তু তার ভঙ্গি বিদ্রূপাত্মক নয়—এ-গল্পের গতি অবিশ্বাসের দিকে, তাতেই ঠাট্টার আঘাতটুকু মুছে গেছে।

প্রাথমিক তিনবার ব্যর্থতার পর চতুর্থ গল্পে পুপুদিকে হাসাতে সক্ষম হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বিশ্বাস না করিয়ে খুশি করতে পারার মধ্যেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির কৌশল নিহিত। তবু রবীন্দ্রনাথ একে পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন—'সে'-কে নিজেরই বিরুদ্ধে সমালোচকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে। 'সে' সমালোচনা করল—চতুর্থ গল্প অসম্ভব গল্প হয়নি, হয়েছে যা-তা। কারণ অসম্ভব গল্পেরও তো একটা বাঁধুনি থাকবে, অসংলগ্ন অসম্ভব গল্প তো যে সে বানাতে পারে। এই সমালোচনা শুনে 'আমি' 'সে'-কে একটি উদাহরণ দিতে বললেন। তখন 'সে' যথার্থ অসম্ভব গল্পের নমুনাস্বরূপ তাসমানিয়াতে তাস খেলার নিমন্ত্রণের গল্প বলল। কিন্তু শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরাঙ্কুনা, পামকুনি দেবী, কিষ্টিনাবুর, ঘেরিউনামু ইত্যাদি ব্যক্তি ও বস্তুর বিদ্‌ঘুটে নামের ওপর হোঁচট খেতে খেতে হাঁফিয়ে উঠে 'আমি' বলল 'থামো থামো', পাঠকের অবস্থাও তথৈবচ। এ-গল্পের দৃষ্টান্ত সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন 'সে' গল্পের চালের লঘুত্ব পরিহার করতে গিয়ে উৎকল্পনার স্বরূপটা ভুল করেছে। হার মেনে 'সে' অসম্ভব গল্পের স্বতন্ত্র একটা সংজ্ঞা উপস্থিত করল—'বিশ্বাস করবার অতীত যা, তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে চলতি ছেলে ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তাহলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি বলে রাখলুম।'

'সে'-র দেওয়া এই সংজ্ঞার চালচিত্রে আবার নির্মিত হল চারটি গল্প, পুপুদিকে 'সে' শোনালো ৬, ৭, ৮, ৯ অধ্যায়-ধৃত চারটি গল্প, কিন্তু পুপুদি তো হাসল না, বরং বিশ্বাস করবার অতীতকে বিশ্বাস করে বসে পুপুদির কখনও প্রশ্ন জাগল, কখনও বিশ্বাস করতে পুপুদির বিষম সন্দেহ জাগল। আবার পাতু গেঁজেলের সঙ্গে 'সে'-র গা বিনিময়ের অবিশ্বাস্য গল্প পুপুদি এতদূর বিশ্বাস করে বসল যে পরের দিন 'সে' কে মুখোমুখি দেখে তার মূর্ছা যাবার উপক্রম। চোখ বুজে চেঁচিয়ে উঠে বলল 'যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি করে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না।' অষ্টম গল্পে 'সে'-র অনুরোধ তার গা ফিরিয়ে দিয়ে নবম গল্পে 'আমি' গুলিবিদ্ধ 'সে'-র মাথার খুলির মধ্যে বাঁদরের মগজ ঢুকিয়ে দিয়ে বিশ্বাসের অতীতকে বিশ্বাস্য করবার চরম গল্প ফাঁদলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'সে'-ই বাধা দিয়ে মাঝপথে গল্প থামিয়ে দিয়েছে। ১০ অধ্যায় থেকে অসম্ভবের গল্প আর জমেনি। 'সে' তার মগজ-বদলের পরদিন থেকে গল্প

জোগানোর কাজে ইস্তফা দিয়েছে। ১০ থেকে ১৪ অধ্যায় পর্যন্ত গল্পগুলি পুপুদির শৈশবের স্মৃতিকথা। এইসূত্রে মাস্টারমশাই কিংবা সুকুমারের কথা এসেছে। সুকুমার ও পুপুদির গোপন হৃদয় বিনিময় অপ্রাপ্তির বেদনায় 'সে' গ্রন্থটির সমাপ্তি ঘটেছে।

অতএব 'সে'-র সংজ্ঞা নয়, বিশ্বাস না করিয়ে মজা লাগাতে পারার মধ্যেই অসম্ভব গল্পের শিল্পচাতুর্য নিহিত— এই প্রতিপাদ্যই গৃহীত হল। অসম্ভব গল্পের চাল সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক সতর্কতার পথেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির কলাকৌশল নিহিত। এইভাবে বিচিত্র গল্প আশ্রয় করে 'নেতি নেতি' করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎকল্পনার হাস্যরসের স্বরূপে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

২.৪ "আলাপে, গল্পে, রসিকতায় 'সে' বড়োদের বই" ঃ

শিশুসাহিত্যের অনেক লেখকের মধ্যেই এইরকম একটা ধারণা প্রচল আছে যে, ছোটরা অবোধ ও নিঃসাড়, ফলে 'করুণা করে' তাঁরা যা ছোটদের জন্য লিখে দেন তা-ই যথেষ্ট; চিন্তা-চেষ্টা-অনুশীলন-কল্পনা ও সংবেদনা-পরীক্ষানিরীক্ষা কোনোটাই সোনে প্রয়োজনীয় নয়। আর কখনো ছোটোদের জন্য লেখা ভারক্রান্ত হয়ে ওঠে উপদেশ-নীতিবচন-জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যে। এই দুটি মনোভাবই শিশুসাহিত্যের প্রতিকূল, কেননা ছোটরা অনেক সময়েই কিন্তু তেমন 'ছেলেমানুষ' নয়। রবীন্দ্রাথ বলেছিলেন নিজেই, 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য।' আর এইজন্যই সত্যকার শিশুসাহিত্য নিছক শিশুমনোরজিনী 'ঝুমঝুমি' নয়— যথার্থ সাহিত্যবোধের সঙ্গে তার কোনো প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই, তা কখনোই খণ্ডিত, অপূর্ণ বা অলীক নয়— সেখানে থাকতেই পারে 'পূর্ণ ও পরিণত জীবনের নানা স্পন্দন, বিশ্বসংসারের যাবতীয় বস্তু ও রহস্য, মানবসত্তারই বিস্ময়কর উন্মীলন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিশুসাহিত্য যে কোনো অনর্থক, ছেলেভুলোনো 'বালসেবা' ব্যাপার ছিল না তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'ঘরের পড়া' (জীবনস্মৃতি)— ''আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর রূপ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল চেলে ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম, যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না— দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।'

তাই রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটদের জন্য লিখলেন, সবসময়েই তা জীবনের গভীর থেকে প্রেরণা জুগিয়েছিলো। 'বালক' পত্রিকার জন্য গল্প-কবিতা-উপন্যাস-গীতিনাট্য-হাস্যকৌতুকই হোক কিংবা আরো পরে 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ'-বইয়ের কবিতাগুলি আর জীবনের শেষ দশকে 'খাপছাড়া' 'গল্পস্বল্প' বা 'সে'—সবক্ষেত্রেই তাঁর এই মনোভাবেরই পরিচয় মেলে। তাছাড়া বিষয়বুদ্ধি-স্বার্থবোধ-মিথ্যাচার সংসারের এ-সব বীভৎস দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন, কিন্তু অরুচিকর ঠেকতো বলে তাদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি লড়াই শুরু হয়নি— শুধু বিরাগ আর অনীহাই প্রকাস করে এসেছেন এতকাল। কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে যেন মনে হল, শুধু এতটুকুতেই তাঁর দায়িত্ব ফুরোয় না। ফলে চারপাশের যাবতীয় অসঙ্গতিকে নির্মমভাবে আঘাত করলেন, সময়ের কালো হাত

প্রকট হয়ে উঠল তিনটি 'মহীয়ান আজগবি' রচনায়—সে, খাপছাড়া আর গল্পসল্প। অনেক রসিকতা, অনেক লক্ষ্যভেদী পরিহাস, অনেক প্রসঙ্গ অত্যন্ত বয়োপ্রাপ্ত ও উদ্দেশ্যময়। সেইসময়ে এই বইগুলো নিতান্ত শিশুসেব্য খুব মোলায়েম হওয়া সম্ভবত ছিল না, কেননা সমকালে তিনি যেসব ছবি আঁকছেন অকস্মাৎ দেখে মনে হয় তা ভৌতিক—এত গাঢ় রঙের ব্যবহার সেখানে। গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গ হয়ে উঠছে নির্মম ও রক্তাপ্লুত (স্মরনীয় মালঞ্চ কিংবা চার অধ্যায়), কবিতার চিত্রকল্পও হয়ে উঠছে ভীষণ, ভয়ানক; আর কিছুদিন পরেই লিখবেন 'সভ্যতার সংকট'—তাঁর শেষ অভিভাষণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ, পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্ব আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের নিশ্চিত পদপাত-আর্থ সামাজিক বিপর্যয়, বিধ্বস্ত মল্যবোধ বিকৃত সাহিত্যাদর্শ—এহেন 'বাস্তব' দেখে অভিমানাহত ক্ষুব্ধ কবির আপাত-দৃশ্য 'শিশুপাঠ্য' বইগুলোও যে অন্যরকম হবে, তা আর বিচিত্র কী।

'সে' লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথের হয়তো কখনো মনে হয়েছিল একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় জগৎকে আমাদের লোভের শিকারে পরিণত করছি—সেজন্যই হুঁহাউ দ্বীপের খ্যাপামির নেশায়-মাতা মানুষের কথা তিনি বলেছিলেন। এই কৌতুকে সমকালীন বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব স্পষ্ট। 'সূর্যের বেগনি পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন।' সোজা ভঙ্গিতে তিনি ঈষৎ বিদ্রূপপরায়ণও। 'ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপসে আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবলই।' এ দ্বীপের মানুষের কথাবলা নিষিদ্ধ এবং তারা চতুষ্পদী হবার সাধনায় ব্যস্ত। সে বলছে দাদামশায়ের এই কল্পবিজ্ঞান কল্পনাই, 'বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে।' গল্পকারের উত্তর, এই অবস্থায় যে মানুষ একদিন পৌঁছবে বিজ্ঞানীরা তার প্রমাণ দিয়েছে ত্রেতাযুগের হনুমানদের একাল পর্যন্ত বেঁচে-থাকার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রূপে আমরা বিদ্ধ হই। এ-দ্বীপে যে মানুষ বেঁচে নেই, হাঁচতে হাঁচতে সবাই মারা পড়েছে সে-কথা বলে বিজ্ঞানের নিষ্ফলতার দিকটিকেই ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ জয়যাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের খোঁচায় ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে চান। 'বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিমনি মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না?' এই 'কুৎসিত' শব্দটি বর্তমান বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজচরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার সাক্ষ্য দেয়।

আবার যখন ২ সংখ্যক কাহিনীতে বিজ্ঞান প্রশ্রয় পায় আর বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মাঝে মাঝে কৌতুকের খেলায় মাতেন (যেমন, ৯ সংখ্যক কাহিনীতে মগজ বদলের অসম্ভব গল্প সাম্প্রতিক বিজ্ঞানচর্চায় এ-ও হয়তো সম্ভব) তখন এই উদ্ভাবনে আমরা মজা পাই, বিজ্ঞানের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিতও হই, তবু ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিটি হারিয়ে যায় না। ১২ সংখ্যক কাহিনীতে বিজ্ঞান আবার জায়গা পেয়ে যায়। দাদামশায় এখানে নাতনির সঙ্গে আকাশের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন—আলোর কণিকা, আলোর প্রবাহ, রেডিয়াম, ইলেকট্রন আমাদের জগৎটাকে যে আরো বিস্ময়কর করে তুলছে তা নিয়ে ঠাট্টার সুর থাকলেও বিজ্ঞানকে এখানে একভাবে স্বীকৃতিই জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

সে-র কিছু কিছু রচনায় শিল্পসাহিত্য সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। এর কিছু আগে 'কল্লোল' ও 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীর 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে ধারণা বাংলা সাহিত্যজগতে একসময় বেশ উত্তপ্ত উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে তখন কলম ধরতে হয়েছিল। প্রবন্ধের পাশাপাশি 'শেষের কবিতা'য় তিনি সমকালীন সাহিত্য-শিল্প ও জীবনবোধকে একভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কল্লোলের কোলাহলের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ যেন 'সে' গ্রন্থে আমাদের বাঘের রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেখানে দেখা যায় 'আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে—যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে বলে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য বলে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব, বাঁ

থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব, হালুম মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব—এমনকি বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব—এত ঔদার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও। এমনকি, এরা পশ্চিমপারের চাষিকৈবর্তদের খেতে চায় এতই এদের মন। ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনেরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষি-কৈবর্ত খেগো, তাই নিয়ে মহা হানাহানি পড়েছে।' —দাদামশায়ের এই বক্তব্য পুপে নিশ্চয় একভাবে বুঝেছিল, আমরাও একভাবে বুঝে নিই। বাঘের চিত্রে রবীন্দ্রনাথ এখানে সমকালীন শিল্পসাহিত্যচিন্তা সম্বধেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। আধুনিক-প্রগতি-প্রচারক-যুক্তি(বাতী-সর্বজীবে সম্মানবোধ পশ্চিমপার দলাদলি প্রাচীন এবং নব্যসম্প্রদায় শব্দগুলি সমকালীন সমাজের ছবি। রবীন্দ্রনাথের এই বক্রোক্তি থেকে তাঁর মনোভাবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাহিত্যশিল্পসৃষ্টিতে নিয়মের প্রয়োজনকে তিনি কখনো অস্বীকার করতেই পারেন কিন্তু উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেন না। হুজুগকে সাহিত্য বলতে তিনি রাজি নন। যে মাস্টারমশায়ের ছবি রবীন্দ্রনাথ এখানে এঁকেছেন তাকেই তো তিনি শিক্ষার জগতে বারে বারে খুঁজেছেন—যে শিক্ষক ছাত্রদের উপলক্ষ করে নিজেকে অজস্রভাবে ছড়িয়ে দেন। এইভাবে সমকালের সঙ্গে একটা যোগসূত্র কোনো-না কোনোভাবে গড়ে ওঠে।

বস্তুত, পরিণত বয়সে অসুর যুগ আর বেসুর সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে পীড়িত করেছিল। তাঁর কটাক্ষ সমকালের নানা রচনায়, যেমন 'প্রহাসিনী'র মাল্যতত্ত্বে

মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, ওটা কি আর চলে
সরস্বতীর গলে?
রিয়্যালিস্টিক প্রসাধন যা নব্য শাস্ত্রে পড়ি
সেটা গলায় দড়ি।

কখনো 'হালকা' ছড়ায় লিখেছেন—

মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুলু ঢুলু
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলু থালু ভাষা ভাব এলোমেলো
ছন্দটা নির্ বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে, 'এতো নয় সোজা।
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।' (খাপছাড়া)

আর এই 'আধুনিক' কবিতাকে জাপানের হাতে তুলে দিতে কবির 'আগ্রহে'র মধ্যেই রয়েছে এইধরনের লেখাকে নস্যাৎ করে দেবার মনোভাব—

জাপানীরা আসে যদি
চিঁড়ে নিক, দই নিক
আধুনিক কবিদের
যত খুশি বই নিক।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার ভাষাকেও 'সে' গ্রন্থে নানাভাবে বিদ্রূপ করেছেন। অদ্ভুত-অদ্ভুত, ববকরণ-তৈতিলকরণ-বৈকুণ্ঠযোগ, উনকুণ্ড পাড়ার চৌচাকলা গ্রাম ইত্যাদি শব্দনির্মাণে কিংবা হৈ হৈ সংঘে ছন্দের মেরুদণ্ড-ভাঙা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কী একভাবে ধরে দিতে চেয়েছিলেন সেদিনের কবিতার 'আধুনিকতা'র সত্যিকারের চেহারা—

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
আঁটসাট্টা!
..... হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কীচ্
গড়গড় গড়গড়
হুড়্দুম দুদ্দাড়
ডান্ডা
ধপাৎ
ঠান্ডা
কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার—

কবিতার এই 'কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারের পর একটি মাত্র কাব্যই লেখা যেতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে কাব্যের নাম 'বেসুর হিড়িম্বের দিগ্বিজয়'। আধুনিক কাল আর কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিরূপতার এমন বিস্তৃত যুগপৎ সরস পরিচয় অন্যত্র দুর্লভ।

এইভাবেই 'সে' পুপেকে শোনানো দাদামশায়ের কাহিনী হলেও তা নানা বিচিত্রভাবে স্পর্শ করে আছে সমকালের শিল্প-সাহিত্য-সমাজকে। সেখানে কন্যার চেহারা আর কন্যার পণের বৃত্তান্ত আর যা-ই হোক নিছক fantacy নয়। গেছোবাবার কাহিনীতে এযাবৎ লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ রবীন্দ্রনাথ করে আসছিলেন তারই রকমফের। শিয়ালের মানুষ-হওয়ার ইচ্ছা আর ডোরাকাটা বাঘের ধর্মপালনে আগ্রহ রূপকথার আদলে রূপক, যা আপাত-উদ্ভট হয়েও সমকালবর্তী। বুদ্ধিদীপ্ত রসোক্তিতে 'সে'র অসাধারণ কিছু পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যাক্—

● ''মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃ সৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।''

● ''দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গামা আমি কখনও ভাবিনি।'' ঐ হাঙ্গামাগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের ওপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটছে চারদিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।''

● ''পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী করে?

তারা বেঁচে থাকে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাতজন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে।'' স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যবস্তু কী।

বস্তুত, 'সে'-র কিছু লেখা 'সন্দেশ' 'রংমশাল' 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন এটি ছোটদের জন্য লেখা। নাতনি পুপে এই বইয়ে উঠে আসাতে সেই ধারণা আরো নিশ্চিত হয়েছিল। আর ছিল ছবির বিচিত্র জগৎ। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এ যেন ছদ্মবেশী শিশুসাহিত্য। সুকুমার আর পুপের হৃদয়বিনিময়ে উদ্ভট এ আখ্যানে ভিন্ন মাত্রা এলো তা-ই নয়, সমকালাতিশায়ী এর রূপ থেকে রূপকে পৌছতে রবীন্দ্রনাথ কোনো দ্বিধা করেননি। তাই ছোটদের হাসির খোরাক জোগায় 'সে' আর বড়োদের

মস্তিষ্কের খোরাক জোগায়—এ গল্প তাই প্রাপ্তবয়স্কের, প্রাপ্তমনস্কেরও

২.৫ রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং চিত্রিত 'সে'—কয়েকটি কথা ঃ

চিত্রকলা রবীন্দ্রসৃষ্টিসাধনার শেষ পর্যায়ের ফসল, প্রচলিত শিক্ষাকে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন—তাঁর ছবি 'নির্মিত' নয়, হয়ে-ওঠা জিনিস এবং মৌলিক। রবীন্দ্রনাথের ছবি অদৃষ্টপূর্ব, অপরিচিত; কিন্তু দর্শকের চোখে অপরিচয়জনিত বিস্ময় থাকলেও সে চোখ একে অস্বাভাবিক বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। রবীন্দ্রচিত্র ব্যক্তিগত, কিন্তু সহিতত্ব-গুণবর্জিত নয় বলে এ ছবি দর্শককে শিল্পীর অভিজ্ঞতার অংশীদার করে তোলে। নিজস্ব পথে শিল্পের এই মনোজয়িতার নামই style, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যে ছবি তিনি একেছেন—তা সে ল্যান্ডস্কেপই হোক্ কিংবা মানুষের মুখ কিংবা জীবজন্তুর, তাতে কোথাও একটা কাঠিন্য-ভীষণতা-গাঢ় রঙের প্রয়োগ-প্রলেপের ব্যাপার আছে। বস্তুর প্রচলিত জ্যামিতিক সৌষম্যকে অস্বীকার করে তাকে নানাভাবে 'বিকৃত' করা হয়েছে এবং তথাকথিত 'বিকৃত' আপাত-উদ্ভট সেই ছবির মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রমানসের এক বিশেষ মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, প্রকৃতি যে শুধু সুন্দর নয়, ভীষণ ভয়ংকর—এই সত্য রবীন্দ্র-চেতনায় প্রথমাবধি কাজ করলেও শেষজীবনে ক্রমশ তা' প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির করাল মূর্তিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখার এমন ক্ষমতা আগে ছিল না। 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'—একথা এই ভঙ্গিতে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন। সাহিত্যের নিসর্গবর্ণনাতেও তখন এই মনোভঙ্গির প্রচ্ছায়া—নির্মম প্রকৃতির ভয়-লাগানো রহস্যময়তা প্রতিফলিত হয়েছে এমন অনেক ল্যান্ডস্কেপে—"একদিন ঝমাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনোখেজুর। দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওত পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে ধাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এই-সব এঁকে চলেছি।" রবীন্দ্রনাথের নিজেরই এই স্বীকারোক্তি। তাঁর নিসর্গচিত্রগুলি যাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা বলতে পারেন—অরণ্যের ঘনত্বে ও জটিলতায়, রাত্রির গা-ছম্‌ছম্ নৈঃশব্দ্যে, রাঢ়ের হু হু করা প্রবল দুপুরের বিভীষিকায় সেইসব ছবিতে মানব-জীবননাট্যেরই আভাস।

কিংবা জীবজন্তুর ছবি, যা রবীন্দ্রনাথের চিত্রজগতে বেশ বড়ো একটা জায়গা জুড়ে রয়েছে—মনের হাতে আঁকা বলেই প্রায়শ কিছু না থেকেও এরা জীবন্ত। আকারের অনুকরণ নেই কিন্তু অঙ্গের মূল Mechanism ঠিক আছে। আলোচ্য ছবিগুলিতে দৈহিক পুঙ্খতা বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় টানটোনে এক-একটি জীবরূপের স্বভাবধর্ম ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ হিংস্র প্রাণীর বলিষ্ঠতা, দুর্বলের নির্জীব দৌর্বল্য, দ্রুতগামী জীবের তূর্ণ গতি, গতিহারার জড়তাময় কুণ্ঠিত মন্থরতা—এসবের জোরালো ব্যঞ্জনা; এসবের জোরালো ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথের আঁকা-বাঘ-গাধা-শেয়াল-কুকুর-কচ্ছপ-কুমির দেখলেই ধরা পড়বে। বাঘের একাধিক ছবির মধ্যে সবচেয়ে নজরে পড়ে 'সে'-ভুক্ত গোটা কয়েক লাইনের টানে ফুটিয়ে তোলা ছবিটি। কাগজ-সার্কাস কিংবা ও চিড়িয়াখানারও নয়—একেবারে আরণ্যক জানোয়ার। জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘশিকারের একটি আশ্চর্য ভাষাচিত্র আছে 'ছেলেবেলা' নামক গ্রন্থে।

"হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ, যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রভয়ানক ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল দেখা নজর, এ যে ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ। অথচ তার ভার নেই যেন।.....কী সহজ সুন্দর চলনের বেগ।"

'সে' গ্রন্থের মধ্যে অনেকবার অনেক জীবজন্তুর কথা এসেছে, তাদের ছবি আঁকা হয়েছে। স্বচিত্রিত এই বইটিতে

দেখলাম, হিংস্রজাতের কাঁটাওয়ালা দাঁত-বের করা আমিষখোর ঘন্টাকর্ণের মতো জীব যেমন সেখানে ওৎ পেতে আছে, তেমনই আছে অদ্ভুত সব মুখ আর মুখোশের আদল। এখানে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমন যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ ছাড়িয়ে আরো দূর অতীতে, মানব-আবির্ভাব হীন পৃথিবীর আদিম অন্ধকারে ভ্রাম্যমান অজ্ঞাতকুলশীল অসম্পূর্ণ অতিকায় প্রাণীদের জগতে চলে গেছে—

''আচ্ছা দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও?
আমি যদি হঠাৎ বলে উঠলুম, 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে, তা হলে তুমি খুশি হতে।''

আসলে, সভ্যতার সেই সংকট-লগ্নে চারদিক নিষ্ঠুর আর রক্তাপ্লুত, রবীন্দ্র-মানস যখন বিচলিত, তখন এইধরনের হানা দেয়া হানা লোগা ভৌতিক ছবিগুলোই তিনি আঁকছেন। 'সিন্ধুপারে যে ওলোট-পালোট কাণ্ড চলছে, সুরাসুরের যে প্রবল সংঘর্ষ, সেই মন্থন ও উল্লম্ফনের চিত্র রচনা করলেন তিনি, আর উপায় হিসেবে বেছে নিলেন আবোলতাবোলকে—তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর কুশীলবরা উলেটপালটে ডিগবাজি খেয়ে গেলো, ঠাট্টায় কৌতুকে বিপর্যস্ত হল,—আর, একদিক থেকে হয়ে উঠলো তাঁর অসহিষ্ণু প্রতিবাদের তির্যক দলিল।''

আর ছবির জগতের এই উলটপুরাণ রবীন্দ্রনাথকে সেইপর্বে অর্থশাসনবদ্ধ বাষিক সৃষ্টির জগতেও এক নতুন পরী(ায় নিযুক্ত(করেছে। সে পরীক্ষা হল ভাষাকে অর্থের সাসন থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা। প্রশ্ন হতে পারে এ চেষ্টার অভিনবত্ব কোথায়? চিরকাল কবিরা ছন্দের দোলা লাগিয়ে বা বিচিত্র ভঙ্গিমায় আশ্রয় নিয়ে ভাষাকে অর্থ-নির্দিষ্টতার নিগড় থেকে মুক্তি দেবার কাজে লেগেছেন, সেই কাজে যোগ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই। ল(ণীয়, শেষ বয়সে ছবি আঁকার কালেই রবীন্দ্রনাথ ভাষাসাহিত্যে অজস্র ছড়া রচনায় হাত দেন—

দাড়ীশ্বরকে মানত করে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল—
স্বপ্নে শেয়াল-কাঁটা পাখি
গালে মারল খাবল।

কলম আর তুলির ভাষার বাইরের তফাতটা বাদ দিলে আসলে এরা জাতে এক। এই ঐক্য নিঃসংশয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে, যেখানে ছড়াগুলিকে কবি সচিত্র রূপ দিয়েছেন। ছড়া আর ছবির এই যমজ রূপ আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে আর সমর্থন করেন স্রষ্টা স্বয়ং। তাঁরই লেখায়—

যেমন তেমন এরা আঁকা বাঁকা
কছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি। (উৎসর্গ, সে)

ছবির রেখা যেমন তার বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাষায় ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শব্দকে তেমনই তার শুদ্ধ শাব্দিক রূপে দাঁড় করাবার দুঃসাহসিক চেষ্টা চলল, অর্থকে নিঃশেষে বিতাড়িত করে। সে চেষ্টার নমুনা আমাদের গ্রাম্য ছড়াতেও আছে—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে

কখনো নিরর্থক শব্দকে আশ্রয় করে সংগীতে তেলেনা সরগম সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছড়াও তেলেনার কাছে ঘেঁষে গেছে দেখা যায়—

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি
লম্বা দাঁড়ায় করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।

'গল্পস্বল্পে'র বাচস্পতির ভাষায় শব্দগুলোও অভিধানের বাঁধা পথে চলেনি। লেখকের মতে সে ভাষা মানের গোলামি-করা কলিযুগের ভাষা নয়, মুখে আপনি উঠে-পড়া সত্যযুগের ভাষা, শুধুই ধ্বনির রাস্তায় চলে।

''পাঠশালার পেতোণ্ডোকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফুসক্‌লিয়ে। বুকের ভিতর করতে থাকতে কুড়ক্কর কুড়ুক্কুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্‌কে যাবে।

তেলেনার ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেল উদ্ভট-রসের 'সে' রচনায়— ''ফস্ করে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিল করণ, বৈষ্কুম্ভ যোগ, তারপরেই হর্ষণযোগ, বিষ্টিকরণ, শেষরাত্তিরে অসৃক্‌যোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র—গোস্বামীতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে— ঘরকরণার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মাযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বরীয়ানযোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।''

২.৬ অনুশীলনী ঃ

- রবীন্দ্ররচনাধারায় 'সে' গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য
- সে ঃ উৎকল্পনার হাস্যরসের স্বরূপসন্ধান
- সে ঃ শিশুসাহিত্যের ছদ্মবেশে বড়োদের বই?
- রবীন্দ্রনাথের ছবি ও 'সে'

২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত) রাতের তারা দিনের রবি (দ্র. রবীন্দ্রনাথের 'সে'; 'দাম নেই নাম নেই'— বিজিতকুমার দত্ত)
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়— কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ
- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য
- শুভঙ্কর চক্রবর্তী— উৎকল্পনার হাস্যরস
- অজিতকুমার ঘোষ— বঙ্গসাহিত্যের হাস্যরসের ধারা
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'সে'